Dhrubapad – Prabandho - Cinema – Pather Panchalir Nepathye – Anil Choudhuri
ধ্রুবপদ - পথের পাঁচালীর নেপথ্যে - অনিল চৌধুরী

।। এক।।

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয় আমার বন্ধু আশীষ বর্মণের সূত্রে। ১৯৫১-৫২ নাগাদ আশীষবাবু এক অদ্ভুত ব্যবসা শুর করেছিলেন। মাত্র সাত-আট টাকা মূলধন নিয়ে হাতিবাগান বাজার থেকে পাঁউরুটি, মাখন, নিউ মার্কেট থেকে মুরগি, মাস্টার্ড, এইসব কিনে স্যা' উইচ বানিয়ে খুব ভালো সেলোফেন পেপারে মুড়ে নিয়ে গিয়ে ব্যারিস্টারদের চেম্বারে আর বড় বড় অফিসে বিক্রি করতেন। সেই স্যা' উইচ যেখানে তৈরি হতো, আমি সেইখানে গিয়ে সব দেখাশোনা করতাম। আর মুরগি মাখন ইত্যাদি যা বেঁচে যেত তাই নিয়ে খাওয়া - দাওয়া সারতাম। ওই স্যাণ্ডউইচ বিক্রি করার সূত্রেই আশীষবাবুর সঙ্গে ডি.জে. কীমারের অফিসে সত্যজিৎ রায় ও অন্যান্য অনেকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

এমন সময় একদিন খবর পেলাম যে আমার ইস্কুলের সহপাঠী কুমুদবন্ধু দাস ফিল্মের ব্যবসা করেছে। সে তখন কোথায় থাকে আমি জানতাম না, কিন্তু আমারই স্কুলের বন্ধু সে। আমি ভাবলাম তাকে ধরে নিশ্চয় সিনেমা আর্টিস্ট দের বাড়ি যাওয়া যাবে, শুটিং দেখা যাবে। এইসব ভেবে আমি আর আমার আর এক বন্ধু শৈলেন চ্যাটার্জি তার খোঁজ করতে শুরু করলাম। বিধায়ক ভট্টাচর্য ছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত নাট্যকার। কলেজ স্ট্রিটের ডি.এম. লাইব্রেরি তাঁর অনেক নাটকের বই ছেপেছিল। সেখানে খোঁজকরতে তারা বাগবাজারে বিধায়কবাবুর বাড়ির ঠিকানা বলে দিল। বিধায়কবাবুর বাড়ি গিয়ে জানলাম যে কুমুদবন্ধু দাস তখন 'কা তব কান্তা' নামে একটা ছবি করছে, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা নিয়ে। শেয়ালদার 'আর্যনিবাস' হোটেলে সে থাকে। শৈলেন আর আমিতৎক্ষণাৎ সেখানে চলে গেলাম। সে সময় সে ঘরে ছিল না। আমরা হোটেলের বাইরে অপেক্ষা করে রইলাম। রাত ন-টা নাগাদ কুমুদ এল। বহুদিন পর দেখা, তাই সকলেই একটু অভিভূত হয়ে পড়লাম। তারপর রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা কুমুদকে বললাম,'শুনছি তুমি নাকি ছবি করছ। সন্ধ্যারাণী তাতে অভিনয় করছেন, আরো অনেক বড় বড় আর্টিস্টরা আছেন তুমি আমাদের তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আলাপ-টালাপ করিয়ে দেবে, শুটিং দেখাতে নিয়ে যাবে?' সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। ঠিক হল, পরদিন সকালেই আমরা তার হোটেলে চলে আসব।

সেই থেকে আমি কুমুদের সঙ্গে থাকি। এদিকে আশীষ বর্মণ একদিন আমায় বললেন যে সত্যজিৎ রায় নামে একজন 'পথের পাঁচালী' সিনেমা করছেন। সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আশীষবাবুর যোগাযোগ ছিল, বোধহয় একটা আত্মীয়তার সূত্রও ছিল। আমি তখন সত্যজিৎ রায়ের সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। শুধু জানতাম তিনি সুকুমার রায়ের ছেলে। কিন্তু 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটা আমার খুব প্রিয় ছিল। তৎক্ষণাৎ আমি কুমুদকে গিয়ে বললাম, 'এই ছবিটা শেষ হয়ে গেলে তুমি 'পথের পাঁচালী' ছবিটা করবে। সত্যজিৎ রায় নামে একজন তার ডিরে*টার। খুব গুণী লোক। সুকুমার রায়ের ছেলে। উপেন্দ্রকিশোর রায়ের নাতি।' কুমুদ সে নামগুলো বিশেষ চিনতে পারল বলে মনে হল না। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটাও বোধহয় সে পড়েনি। তবুও সে বলল, 'ঠিক আছে। এই ছবিটা শেষ হোক। তারপর দেখা যাবে।

'কা তব কান্তা' ছবি তৈরি শেষ হয়ে গেল। ডিস্ট্রিবিউটার দেখে বলল, 'ছবি তো ভালোই হয়েছে। কিন্তু শেষকালে স্ত্রী যে স্বামীর পদযুগল থেকে বঞ্চিত হল, এটা বাংলাদেশের মহিলারা নেবে না। আপনি শেষ দৃশ্যটা আবার শুট্ ক'রে অন্তত পরজন্মে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হল, এটা দেখিয়ে দিন।' কুমুদ রাজি হয়ে গেল। রি-শুট করার খরচটা ডিস্ট্রিবিউটার আগাম দিল। এই একদিনের শুটিং -এ আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল সন্ধ্যারাণীকে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে, বি. দাস কোম্পানি থেকে একটা বল্লম সংগ্রহ ক'রে, বাগবাজারে পরিচালক বিধায়ক ভট্টাচার্যকে তুলে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে শুটিং -এর জায়গায় সময়মতো পৌঁছে যাওয়া। আমি সোৎসাহে সন্ধ্যারাণীকে তুলে, ড্রেস সাপ্লায়ার বি. দাসের দোকান থেকে বল্লম নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে গেলাম। গাড়ি থেকে নামতেই খেয়াল হল যে বিধায়ক ভট্টাচার্যকে তুলতে ভুলে গিয়েছি। আবার গাড়ি নিয়ে ছুটলাম বাগবাজারে। প্রোডাকশন ম্যানেজারির কাজে আমার হাতেখড়ির দিন আমারই দোষে এক ঘন্টা শুটিং পিছিয়ে গেল।

আশীষবাবু তখনো মাঝেমাঝেই আমাকে বলছেন, সত্যজিৎ রায়ের জন্য প্রোডিউসার যোগাড় করার ব্যাপারটা কী হল? আমি তাঁকে আশ্বস্ত করতাম, 'দাঁড়ান, এ ছবিটা তো সবে শেষ হল। রিলিস হোক। সবাই বলছে ছবিটা দারুণ চলবে। তাই কোনো চিন্তা নেই।' একদিন আশীষবাবু আমায় বললেন, 'আচ্ছা, সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আপনার সেই বন্ধুর একবার আলাপ করিয়ে দিলে হয় না?' আমার মাথায় তখন একটা মতলব এল। কুমুদের কোম্পানির নাম ছিল 'বান্ধব পিকচাস'। আম ভাবলাম সত্যজিৎ রায়কে কুমুদের কোম্পানির জন্য একটা 'লোগো' (logo) তৈরি ক'রে দিতে বললে কেমন হয়? তাহলে ঐ সূত্রে ওঁদের মধ্যে একটা যোগাযোগ তৈরি হয়ে যাবে। তখন কুমুদকে নিয়ে একদিন আমি ডি. জে. কীমারের অফিসে সত্যজিৎবাবুর কাছে গেলাম। তিনি সব শুনলেন।তারপর বললেন, 'বান্ধব পিকচার্স নামটা থেকে কিছু একটা বের করা তো একটু মুশকিল। যাই হোক, আপনারা দু-দিন পরে আসবেন।' দু-দিন পর আমরা আবার গেলাম। তিনি তখন দু'টো ডিজাইন দেখালেন। একটা আমার মনে আছে। তিনজন বন্ধু - একজন আর একজনের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেটাই কুমুদের পছন্দ হল। অন্যটা কি ছিল আমার মনে নেই। কুমুদ তখন বলল, 'এ কাজটার জন্য আপনাকে কত দেব?' সত্যজিৎবাবু খুব লজ্জা পেয়ে গেলেন। বললেন, 'না না, এর জন্য আর কী-!' কুমুদও খুব জোর করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত যতদূর মনে পড়ে ওঁকে পঞ্চাশ চাকা দেওয়া হয়েছিল কাজটার জন্য।

কিছুদিন পর সত্যজিৎবাবুকে একদিন কুমুদের কাছে নিয়ে গেলাম শেয়ালদার আর্যনিবাস হোটেলে 'পথের পাঁচালী'-র স্ক্রিপ্ট শোনাবার জন্য। সত্যজিৎবাবু তাঁর খাতা খুলে পড়তে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর দেখলাম কুমুদ কেমন উসখুস করছে, মোটেই মনোযোগ দিচ্ছে না। স্ক্রিপ্টটা পড়া শেষ হয়ে গেল। আমি কিন্তু শুনছিলাম না। আমার মন ছিল কুমুদ ঠিক কী-ভাবে ব্যাপারটাকে নিচ্ছে সেই দিকে। কুমুদের ভাবগতিক দেখে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

স্ক্রিপ্ট শেষ ক'রে সত্যজিৎবাবু চলে গেলেন। আমি কুমুদকে খুব গালাগাল করলাম ঐরকম ব্যবহার করার জন্য। কুমুদ বলল, 'দূর, এ কী স্ক্রিপ্ট হয়েছে? কোনো গান টান নেই।' আমি বললাম, 'গানের সুযোগ কোথায়?' কুমুদ বলল, 'কেন, দুর্গা ঐরকম মাঠে মাঠে ঘুরত, একটা গান গাইতে পারে না?' আমার সঙ্গে তার খুব ঝগড়া হল আমি ওকে মূর্খ-টুর্খ অনেক কিছু বললাম। তারপর বাড়ি চলে এলাম।

আমি সে-সময় প্রায় রোজই ওর ওখানে যেতাম। এই ঘটনার পর দিন-পনের আমি আর ওর সঙ্গে দেখা করলাম না। একদিন দেখলাম কুমুদই আমার বাড়িতে এল। এসে বলল, 'ঠিক আছে। ও ছবির ভালোমন্দ আমি কিছু জানি না। তুমি যখন বলছ তখনও ছবি আমি করব। কা তব কান্তা রিলিস করুক। যদি টাকা ওঠে তাহলে পথের পাঁচালী করব।'

'কা তব কান্তা' রিলিস করল। প্রথম রবিবার হাউসফুল হল। ডিস্ট্রিবিউটার মনে করল বইটার ব' অফিস হবে। দিনকতকখুব আনন্দ, খাওয়া - দাওয়া, পার্টি ইত্যাদি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছবিটা ফ্লপ করল। কুমুদ তখন বলল, 'এতগুলো টাকা জলে গেল! আমার হাতে তো আর টাকা নেই। পথের পাঁচালী যদি করতে হয় তাহলে আমার দাদাদের কাছে টাকা চাইতে হবে।' কুমুদের দাদারা থাকতেন মেদিনীপুরে। কুমুদ তাঁদের কাছে গেল। তাঁরা এই বিপজ্জনক ব্যবসায় আরো টাকা ঢালতে মোটেই রাজি হলেন না।

এদিকে সত্যজিৎবাবু, সুব্রতবাবু, বংশীবাবু, এঁদের সঙ্গে আমার মাঝেমাঝেই দেখা হয়। বুঝতে পারতাম, ওঁরা খুব আশা ক'রে বসে আছেন যে আমি একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারব। কুমুদের অবস্থাটা জানার পর আমি আর ওঁদের কাছে গিয়ে সাহস ক'রে বলতে পারলাম না যে ব্যবস্থা হয় নি, হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। বেশ কিছুদিন ওঁদের সঙ্গে আমি দেখা করলাম না। আশীষ বর্মণকে বললাম পুরো ব্যাপারটা। একদিন বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে ট্রাম থেকে নেমেছি, হঠাৎ সুব্রত মিত্র আমাকে ধরে ফেললেন। বললেন, 'একি অনিলবাবু, পালাচ্ছেন কেন?' আমি বললাম, 'না না, পালাব কেন?' উনি বললেন, 'চলুন মানিকদার ওখানে।' আমি বললাম, 'আমি আর গিয়ে কী করব? আমি তো আর টাকাওয়ালা নই। একটাই টাকাওয়ালা বন্ধু ছিল। তার অবস্থা কী হয়েছে তা তো জানো।আমি আশীষবাবুর মারফত খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি আর ওখানে যাব না, আমার খুব অস্বস্তি হবে।' কিন্তু সুব্রতবাবু নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত ওঁকে আমি কথা দিলাম যে পরদিন সত্যজিৎবাবুর ওখানে যাব।

পরদিন গেলাম। ওঁরা খুব আপ্যায়ণ করলেন। আমি তাঁদের এভাবে আশাহত করার জন্য অনেকবার ক্ষমা চাইলাম। ওঁরাবললেন, 'তাতে কী হয়েছে? এটা হল না, আবার না হয় অন্য জায়গায় চেষ্টা ক'রে দেখা যাবে। আপনি আমাদের সঙ্গ ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? থেকে যান আমাদের সঙ্গে।' সেই থেকে গেলাম।

তারপর থেকে মাঝে মাঝে আমি ডি. জে. কীমারের অফিসে যাই সত্যজিৎবাবুর কাছে। দুপুরে লাঞ্চের সময় ওখান থেকেদু'জনে হেঁটে আসি সেন্ট্রাল এভিনিউ কফি হাইসে। ওখানে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল) শাঁটুল গুপ্ত, কমল মজুমদার, চিদানন্দ দাশগুপ্ত।

।।দুই।।

একদিন ডি. জে. কীমারে গেছি। সত্যজিৎবাবু হঠাৎ বললেন, 'আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। এই দোকানটার মধ্যে থাকাটা আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আসলে ফিল্ম লাইনে আমি নতুন লোক। প্রোডিউসাররা জানেনা যে আমি ছবি তৈরি করতে জানি কি না। তাই তারা বেশি টাকা ঢালতে রাজি হচ্ছে না। তই আমি স্থির করেছি, আমার ইন্সিওরেন্স থেকে আমি ছসাত হাজার টাকা ধার করব। আর বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে আরো হাজার চারেক পাব। এই দশ হাজার টাকা দিয়ে পথের পাঁচালী-র খানিকটা অংশ তুলে সেই ছবিটি তারপর প্রোডিউসারদের দেখাব। তারা যদি তখন বলে যে আমি ফিল্ম করতে জানি, তাহলে তারা টাকা দেবে। আর যদি বলে যে ফিল্ম করতে জানি না, তাহলে বুঝে নেব যে আমার দ্বারা আর ছবি করা হবে না। কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হয়েই সারা জীবন কাটাতেহবে।'

এই তারিখটা ঠিক আমার মনে নেই, কিন্তু 'পথের পাঁচালী' শুরু হওয়ার দিন বোধহয় এটাকেই বলা উচিত। এর ক-দিন পর সত্যজিৎবাবু আমায় বললেন, 'দারুণ একটা আইডিয়া এসেছে। তাতে অল্প টাকায় অনেক ছবি তোলা যাবে। ১৬ মিলিমিটারের ছবি তুবল। তারপর তাকে ব্লো-আপ ক'রে ৩৫ মিলিমিটার করব।' সেই অনুযায়ী সত্যজিৎবাবু আর সুব্রতবাবু ১৬ মিলিমিটার ক্যামেরা আর ফিল্ম নিয়ে পথের পাঁচালী-র গ্রাম গোপালনগরে গিয়ে একদিন কিছু শুটিং করলেন। তারপর সেই ফিল্ম বোম্বেপাঠানো হল ব্লো-আপ করানোর জন্য। ব্লো-আপ হয়ে ছবি ফিরে এল। আমরা বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারিতে সেটা ৩৫ মিলিমিটারে দেখালাম। বৃষ্টির একটা দৃশ্য ছিল, কলাপাতার ওপর বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু দেখা গেল, ছবিটা ঠিক হয় নি,, খুব ফাস্ট হচ্ছে। অগত্যা ঐ পদ্ধতিটা বাতিল ক'রে দিতে হল। ৩৫ মিলিমিটারের ছবি তোলা হবে ঠিক হল।

বোড়াল গ্রামে বাড়ি ঠিক হয়ে গেল। বোধহয় মাসে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া। বংশীবাবু সেই বাড়িটা রি -কনডিশন করার কাজসুরু ক'রে দিলেন। ইতিমধ্যে অপু - দুর্গাকে নিয়ে কিছু দৃশ্য তোলা হল। লাইট হাইসের সামনে এভারেস্ট স্টুডিও ছিল। সেখান থেকে একটা ৩৫ মিলিমিটার ওয়াল(ব্লপ্তপ্ত) ক্যামেরা ভাড়া নিয়ে আমরা পালশীট বলে একটা জায়গায় গেলাম কাশবনের শুটিং করতে। সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে সেই আমার প্রথম শুটিং এর অভিজ্ঞতা।

গ্রা' ট্রাঙ্ক রোডের ওপর বেশ উঁচুতে ক্যামেরাটা বসানো হল। প্রথম শট্টা হল, অপু কাশবনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেক্যামেরার দিকে আসছে। তার মাথায় সেই রাংতার মুকুট আর হাতে একটা আখের টুকরো। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল, আমি কাশবনের আড়ালে বসে থাকব, বংশীবাবু রুমাল নাড়লে আমি অপুর গায়ে ঠেলা দেব। অপু চলতে শুরু করবে। দু)একবার হাঁটা হল, সত্যজিৎবাবুর পছন্দ হল না। তখন অপুর যাওয়ার পথে কিছু কিছু বাধা সৃষ্টি করা হল, যাতে সেগুলো ডিঙিয়ে ওকে যেতে হয়। তাছাড়া এদিক ওদিক কিছু লোককে রাখা হল। তারা মাঝে মাঝে ডাকবে - যখন যেদি ক থেকে ডাকবে অপু সেই - সেই দিকে তাকাবে। এইভাবে রিহার্সল দিয়ে শটটা তোলার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হল। তখনো সত্যজিৎবাবু পুরোপুরি সন্তুষ্ট হন নি। তিনি তখন অপুকে বললেন হাঁটতে হাঁটতে একটা বিশেষ জায়গায় এসে পা-টা পেছন দিকে তুলে হাত দিয়ে একটু চুলকে নিতে। সেটারও একটা 'মনিটার' বা রিহার্সাল হল। বংশীবাবু সেই জায়গাটা একটা চিহ্ন দিয়ে রাখলেন যাতে অপু বুঝতে পারে কোথায় চুলকোতে হবে। শট্ নেওয়া শুরু হল। বংশীবাবু রুমাল নাড়লেন, আমি অপুকে ঠেলে দিলাম। অপু চলতে শুরু করল। আমি আড়ালে বসে রয়েছি, কিছু দেখতে পাচ্ছি না। অনেকক্ষণ পর আমি শট্ শেষ হয়ে গেছে মনে ক'রে উঠে দাঁড়ালাম। ক্যামেরার কাছে যাঁরা চিলেন তাঁরা সব হৈ - হৈ ক'রে উঠলেন। তখনো শট্ শেষ হয় নি। 'পথের পাঁচালী'-র প্রথম শট্টা আমার জন্য এন-জি হয়েছিল।

বংশীবাবু বাড়ি রি-কনডিশনের কাজ করছেন। আমি রোজ সকালে পাঁউরুটি ডিম, পলসন মাখন, একটা সাবান, কেরোসিন তেল- এসব নিয়ে যেতাম। দুপুরবেলা টোস্ট আর অমলেট তৈরি ক'রে দু'জনে খেতাম। বংশীব াবু বাড়ির দরজা পোড়াতেন, খুঁটিগুলো পোড়াতেন। গ্রামের লোকেরা ভিড় ক'রে তাঁর কাজ দেখত। সারাদিন আমার আর বিশেষ কাজ থাকত না। একদিন দেখলামবাড়ির দরজার সামনের জায়গাটা কেমন জংলা-জংলা হয়ে আছে। আমি ভাবলাম জায়গাটা পরিষ্কার ক'রে দিই। সত্য বলে গ্রামের একজন আমাদের সঙ্গে কাজ করত। তাকে নিয়ে আমি সেই জায়গাটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে ফেললাম। সত্যজিৎবাবু শনিবার - রবিবার ক'রে যেতেন। পরে শনিবার তিনি গিয়েই বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে! এসব কে করল? আমি কোথায় বাহবা পাব ভেবেছিলাম। সর্বনাশ হয়ে গেয়ে শুনেই বুঝলাম দারুণ একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছি। আমি আমতা আমতা ক'রে বললাম, 'আমিই তো পরিষ্কার করেছি। তাতে যে খারাপ হবে আমি তো বুঝতে পারি নি।' উনি বললেন, 'এ তো শুটিংই হবে না। কবে এসব জায়গায় আবার ঘাস হবে, ততদিন বসে থাকতে হবে।' আমি পূর্ব বাংলার গ্রামের ছেলে। কী ক'রে চট্ ক'রে সবুজ ক'রে তো লা যায় আমার তা খুব ভালো করেই জানা ছিল। আমি বললাম, 'আপনি কিছু ভাববেন না। সাত তিনের মধ্যে আমি সবটা সবুজ ক'রে দেব।' পরের দিন আমি খানিকটা সর্ষে কিনে নিয়ে গেলাম। সেটা ভালো ক'রে ছড়িয়ে দিলাম, আর রোত তাতে খুব ক'রে জল দিলাম। সাতদিনের মধ্যেই গোটা জায়গাটা আবার সবুজ হয়ে গেল।

প্রথম প্রথম বোড়াল গ্রামের লোকেরা আমাদের সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে চলত। বোধহয় পাগল-টাগল ভাবত। সত্যজিৎবাবু মাঝে মাঝে আসতেন। ওরা দেখত একটা লম্বা লোক এসে কী-সব করছে। একদিন সত্যজিৎবাবু তাদের হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এইরকম দেখতে একজন লোককে সেদিন দেখেছিলাম। তাঁকে একটু খবর দিতে পারেন?' গ্রামের লোকেরা বর্ণনা শুনে একজন লোককে ধরে নিয়ে এল। সত্যজিৎবাবু বললেন, 'না, এ নয়, সে এইরকম দেখতে।' বলে আবার তিনি বর্ণনা দিলেন। তারা তখন আর একজনকে নিয়ে এল। সত্যজিৎবাবু আবার বললেন, 'না, এঁর কথা বলছি না।' তখন আর বোঝাতে না পেরে ওঁর স্ক্রিপ্টের খাতার একটা পাতায় উনি একটা মুখ এঁকে দিলেন। ওরা আট-দশজন লোক একেবারে সমস্বরে বলে উঠল, 'ও, আমাদের হরিবাবু!' বলে তাঁকে ধরে নিয়ে এল। 'পথের পাঁচালী'-তে সেই হরিবাবু হচ্ছে যার মাথায় প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা পড়েছিল। ছবি আঁকার এই ঘটনাটা একেবারে ম্যাজিকের মতো কাজ করেছিল। কেননা তার পরই দেখলাম আমাদের প্রতি গ্রামের লোকেদের ব্যবহারে বেশ একটা পরিবর্তন হয়ে গেল। চা-সিগারেট এসব বাকিতে পাওয়া খুব সহজ হয়ে গেল। চায়ের দোকানে বসে বহুদিন পর্যন্ত ওখানকার লোকেরা আমায় ঐ ঘটনাটার কথা বলত।

।।তিন।।

পথের পাঁচালী-তে অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেকটার ছিলেন শান্তি চ্যাটার্জি, আশীষ বর্মণ আর সুবীর হাজরা। দুলাল দত্ত ছিলেন এডিটার, বংশীবাবু আর্ট ডিরেকটার, সুব্রত মিত্র ক্যামেরাম্যান, আমি প্রোডাকশন ম্যানেজার, আর আমার সঙ্গে কাজ করত বংশীবাবুরই পরিচিত একজন, তার নাম সুরেন সাহু। শান্তিবাবুর অন্য কোনো উপার্জন ছিল না। ওঁকে আমি মাসে মাসে টাকা দিতাম। দুলাল দত্তকে নিয়মিত টাকা দেওয়ার কোনো ব্যাপার ছিল না। ছবি শেষ হলে, তারপর সম্ভব হলে টাকা দেওয়া হবে - এইরকমই বোঝাপড়া ছিল। সুব্রতবাবু আর বংশীবাবুর প্রাপ্য ছিল রোজ এক প্যাকেট ক'রে ক্যাপস্টান সিগারেট।

বাড়ি রি-কনডিশন করতে গিয়ে বংশীবাবুর কিন্তু অনেক খরচ হয়ে গেল। দরজা, খুঁটি, চাল, গোয়ালঘর, দেয়াল, তুলসীমঞ্চ সবই প্রায় নতুন ক'রে করতে হল। এর ফল হল যে সত্যজিৎবাবু আগে যে পরিকল্পনা করেছিলেন, পথের পাঁচালী-র একটা কোনো নাটকীয় অংশ নিয়ে তার উপর একটা ছোট ফিল্ম ক'রে প্রোডিউসারদের দেখানো, সে পরিকল্পনা বাতিল করতে হল। সত্যজিৎবাবুর যোগাড় করা টাকা প্রায় সবই শেষ হয়ে গেল। উনি তখন হুণ্ডিতেও দু'হাজার টাকা ধার করেছিলেন। তার জন্য মাসে মাসে সুদ দিতেন। সেটা তখন আমি জানতাম না। পরে জেনেছিলাম।

তখন 'দর্পণ কথাচিত্র' নামে নিজেদেরই একটা প্রোডিউসিং কোম্পানি খোলা হল। আর শুরু হল ডিস্ট্রিবিউটার খোঁজা। পূর্ণ সিনেমায় তখন একটা বাংলা ছবি চলছে। আমি পূর্ণতে খোঁজ নিয়ে সে-ছবির ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসে গেলাম। প্যারাডাইস সিনেমার উল্টোদিকে সেই ডিস্ট্রিবিউটারের অফিস। সত্যজিৎ রায় যে পথের পাঁচালী করেছেন এ-খবরটা তখন দু-একটা কাগজে বেরিয়েছিল। আমি পথের পাঁচালী-র ব্যাপারে এসেছি শুনে ওঁরা বেশ উৎসাহ দেখালেন। আমি দেখলাম এই সুযোগ ফসকে যাওয়া উচিত নয়। বললাম, 'আপনারা কি আজকেই সত্যজিৎবাবুর বাড়িতে আসতে পারেন?' ওঁরা রাজি হলেন। আমি তখন ওঁদের নিয়ে ৩১-এ লেক এভিনিউ তে সত্যজিৎবাবুর বাড়ি এলাম। ওঁরা সত্যজিৎবাবুর কাছে জানতে চাইলেন পথের পাঁচালী ছবি করার রাইট ওদের কেনাআছে কি না। সত্যজিৎবাবু বললেন বিভূতিভূষণের স্ত্রী রমা দেবীর সঙ্গে ওঁর কথা হয়েছে। যদি লিখিত রাইটের দরকার হয় উনি সংগ্রহ ক'রে নিতে পারবেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বলে তখন স্থির হল, সাত-দিনের মধ্যে সত্যজিৎবাবু রমাদেবীর কাছ থেকে রাইটের কাগজটা নিয়ে আসবেন। 'দর্পণ কথাচিত্র' -এর কিছু লেটারহেডও ওঁদের দিয়ে দেওয়া হল, যদি আমাদের পক্ষ থেকে কোনো দলিলপত্র তৈরি করতে হয়। ঠিক হল, ছবি তৈরির টাকা ওঁরা দেবেন।

সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে কথা ছিল উনি ব্যারাকপুরে গিয়ে রমা দেবীর কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়ে আসবেন। আমি প্যারাডাইসের নিচে অপেক্ষা করব। উনি এলেন। এসেই বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে।' আমি বললাম, 'কী হল?' উনি বললেন, 'এরা অত্যন্ত পাজি লোক। এর মধ্যেই ওরা রমা দেবীর কাছে গিয়েছিল। গিয়ে নানারকম সব কথা বলে এসেছে। চলুন ওদের অফিসে।' আমরা ওপরে গেলাম। সত্যজিৎবাবু খুব রেগে ওঁদের বললেন, 'আমার সঙ্গে আপনাদের সেদিন কথা হয়ে গেল। তারপর আপনারা এসব উল্টোপাল্টা কাজ করছেন কেন?' তখন জানতে পারলাম যে ওঁরা রাইটটা নিজেদের নামে লিখিয়ে নিয়ে দেবকীবাবুকে দিয়ে ছবি করাতে চাইছিলেন। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে শুনে ওঁরা তখন সত্যজিৎবাবুকে বললেন, 'ঠিক আছে।

আপনিই ছবি করুন। আমরা এখনো রাজি আছি আপনাকে টাকা দিতে।' সত্যজিৎবাবু বললেন, 'আপনারা তো রাজি আছেন, কিন্তু রমা দেবী আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে আমায় বারণ করেছেন। আমি আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে পারব না।' এই বলে উনি ওখান থেকে চলে এলেন।

এর কিছুদিন পর রাণা দত্ত নামে এক নতুন ডিস্ট্রিবিউশন ফার্ম পথের পাঁচালী নিতে রাজি হল। তারা তখন তপন সিংহর প্রথম ছবি 'অঙ্কুশ' -এর ডিস্ট্রিবিউশণ নিয়েছে। আর 'পাশের বাড়ি' নামে যে ছবিটা খুব চলেছিল, সেই লেখকের লেখা 'শ্বশুরবাড়ি' বলে আর একটা ছবিও ওরা নিয়েছিল। ওরা 'পথের পাঁচালী'-র শুটিং এর জন্য কিছু কিছু করে টাকা দিতে আরম্ভ করল। আর্টিস্ট সব যোগাড় হয়ে গেল। অপু-দুর্গাকে তো টাকা-কড়ি দেওয়ার কোনো ব্যাপার ছিল না। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নয়। চুণিবালাকে প্রতিদিন কুড়ি টাকা ক'রে আমি দিতাম। কানুবাবু খুব সম্ভব দিনে পঞ্চাশ কি একশ টাকা ক'রে নিতেন। অপর্ণা দেবী, রেবা দেবীও পঞ্চাশ ক'রে নিতেন। এ-ব্যাপারে কোনো দরাদরি কারো সঙ্গেই করতে হয়নি। জানাই ছিল, এর বেশি দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।সুধীর মুখার্জি নামে একজন প্রোডিউসারের একটা কিনেভক্স মেশিন ভ্যানে ফিট করা ছিল। সাউন্ড রেকর্ডিং -এর জন্য সেই ভ্যান নিয়ে যাওয়া হতো বোড়াল গ্রামে। টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও থেকে মিচেল (ভন্দ্বন্তুড়দ্বপ্তপ্ত) ক্যামেরা ভাড়া নেওয়া হতো। সেই ক্যামেরা নিয়ে আসতেন দীনেন গুপ্ত। একদিন তাঁর সঙ্গে এলেন তাঁরই সহকর্মী, তার নাম সৌমেন্দু রায়, যিনি এখন সত্যজিৎবাবুর ক্যামেরাম্যান। এর আগে কিছুদিন আমরা দেওজিভাইয়ের মিচেল ক্যামেরা নিয়েছিলাম।

পথের পাঁচালী যখন তৈরি হচ্ছে, স্টুডিও মহলে কিন্তু তাই নিয়ে বেশ গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকেই উপন্যাসটি পড়েছিলেন, সে কারণে একটা কৌতূহল ছিল ছবিটা সম্বন্ধে। তার ওপর গোটা ছবিটা আউটডোরে হচ্ছে, এটা তো খুবই চাঞ্চল্যের বিষয় ছিল। সুব্রতবাবুর লাইটিং করার নানারকম পদ্ধতির কথাও স্টুডিও পাড়ায় ছড়াল। ফলে ঐ মহলে অন্তত বেশ একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

বোড়ালে শুটিং চলার সময় আমায় স্বভাবতই খুব ভোরে উঠতে হতো। আমার অ্যালার্ম ঘড়ি ছিল না। সকালে ওঠার জন্য আমি ভাবলাম, রাত্রে খুব ক'রে জল খেয়ে শুলে নিশ্চয় ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে যাবে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে নানা শারীরিক বিপত্তিহতে শুরু করল। তখন আমাদের ট্যাি ড্রাইভার বচন সিং বুদ্ধি দিল, রাত্রে ওর গাড়িতেই শুয়ে থাকতে। মাঝরাত্রে ট্রাম চলা বন্ধ হয়ে গেলে বচন সিং ওর গাড়িটা টালিগঞ্জ ব্রিজের নিচে ঠিক ট্রামলাইনের ওপর রেখে দিত। ভোর চারটের সময় ট্রাম এসে ক্রমাগত ঘন্টা দিয়ে ও প্রচণ্ড গালাগাল দিয়ে আমাদের জাগিয়ে দিত!

'অঙ্কুশ' আর 'শ্বশুরবাড়ি' কিন্তু চলল না। ডিস্ট্রিবিউটারের টাকার খুব টানাটানি পড়ে গেল। চুণিবালার টাকা বাকি পড়ল।ক্রমে শুটিং রাখাই অসুবিধা হয়ে গেল।' আমি একদিন রাণাবাবুকে বললাম, 'আর একদিন অন্তত শুটিং রাখা দরকার, আলোর ব্যাপারটা না হলে ঠিক থাকবে না। অন্তত আড়াইশো টাকার আপনি ব্যবস্থা করে দিন! পথের পাঁচালী-র ব্যাপারে রাণা দত্তদের খুব উৎসাহ ছিল, আর সত্যজিৎবাবুকে ওঁরা খুব সম্মান করতেন। রাণাবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি শুটিং রাখুন। আমি দেখছি শ-আড়াইটাকা যাতে বন্দোবস্ত করা যায়।' আমি আগের দিন সকলকে খবর-টবর দিয়ে শুটিং -এর ব্যবস্থা করলাম। সেদিন সকালে সকলকেপৌঁছে দিয়ে আমি আবার কলকাতায় এলাম রাণাবাবুর কাছ থেকে টাকা দিয়ে সকলের খাওয়া -দাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য।

রাণা দত্তের অফিসে যেতে উনি বললেন, 'দেখুন অনিলবাবু, যে টাকাটা আজ পাওয়ার কথা ছিল সেটা পাওয়া যায় নি। আপনাকে টাকাটা আজ দিতে পারলাম না।' আমি বললাম, 'বলছেন কি? ওঁরা সবাই ওখানে শুটিং করছেন। দুপুরে খাবারের একটাব্যবস্থা করতে হবে। অন্তত কিছু টাকা আমায় যোগাড় করে দিন।' উনি বললেন, 'আমার কাছে একেবারেই টাকা নেই। আমি কিছুতেই আজ আপনার টাকার বন্দোবস্ত করতে পারব না।' আমি তো বেজায় ফাঁপরে পড়লাম। কোথা থেকে টাকা যোগাড় করি? অতগুলো লোক সারাদিন না খেয়ে শুটিং করবে কি ক'রে? কি করব বুঝতে না পেরে আমি সত্যজিৎবাবুর বাড়িতে চলে গেলাম। কড়া নাড়তে বৌদি বেরিয়ে এলেন বললেন, 'কিন্তু এটা তো মাসের শেষ। আমার কাছে মোটে তিন দিনের বাজার খরচটা আছে। তার বেশি টাকা তো আমার কাছে নেই।' আমার শেষ আশাটাও মিলিয়ে গেল। হঠাৎ উনি বললেন, 'আচ্ছা সোনার গয়না দিলে আপনি কিছু ব্যবস্থা করতে পারবেন?' আমি বললাম, 'তাই দিন। আমি দেখি চেষ্টা করে।' উনি তখন কাপড়ের পুঁটলিতে কিছু সোনার গয়না এনে দিলেন।

সোনার গয়না কোথায় বন্দক নেওয়া হয় আমি জানতাম না। সাদার্ন এভিনিউতে একটা গয়নার দোকান ছিল। আমি সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। ওরা বলল, 'ওয়েলেসলি স্ট্রিটে পরেশ দত্তের দোকান আছে, সেখানে যান।' চলে গেলাম সেখানে। তারা গয়নাগুলো এক এক ক'রে বের ক'রে কষ্টিপাথরে ঘষলো। তারপর ওজন করে বলল, 'তেরশো টাকার মতো আপনাকে দিতে পারি। আর মাসে সুদ পড়বে এত)।' ঠিক কত) সেটা এখন আমার মনে নেই।

আড়াইশো টাকার জায়গায় তেরশো টাকা পেয়ে তো খুব আনন্দ। প্রচুর খাবার-দাবার কিনলাম। তাছাড়া এটা ভেবেও বেজায় ফুর্তি হল যে এই টাকায় এবার অনেক শুটিং করা যাবে। আমি গিয়ে ঘোষণা করে দিলাম যে আরো দু-চার দিন শুটিং এর টাকা পাওয়া গেছে, আপনারা শুটিং চালিয়ে যান। যার যার টাকা পাওনা ছিল, সবাইকে সব পাওনা মিটিয়ে দিলম। কাউকে বললাম না কী ক'রে টাকা পাওয়া গেছে। এমনকি সত্যজিৎবাবুকেও বললাম না। উনি নিশ্চয় পরে বাড়ি গিয়ে বৌদির কাছ থেকে জেনেছিলেন। কিন্তু আমাকে কখনো কিছু বলেননি।

এই প্রসঙ্গে আর একটা গল্প বলে নিই। মাসিমা, অর্থাৎ সত্যজিৎবাবুর মা, উনি এই ফিল্ম করার ব্যাপারে পক্ষে-বিপক্ষে কিছুই বলতেন না। মনে মনে একটা দুশ্চিন্তা নিশ্চয় ছিল, ছেলে এরকম স্থায়ী চাকরি ছেড়ে ফিল্ম লাইনের অনিশ্চয়তার মধ্যে ঢু কছে! কিন্তু মুখে কখনো কিছু বলতেন না। এই গয়না বন্ধক দেওয়ার ব্যাপারটা সমস্তই ওঁর কাছে সম্পূর্ণ গোপন করা হয়েছিল। একদিন হঠাৎ সত্যজিৎবাবু বললেন, 'অনিলবাবু, ঐ গয়নাগুলো দু-একদিনের জন্য খুব দরকার।' সে সময় সন্দীপ হবে। সেই উপলক্ষে বাড়িতেএকটা অনুষ্ঠানে গয়নাগুলো বৌদির প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, মাসিমাকে কিছুতেই জানানো চলবে না যে গয়নাগুলো নেই, বন্ধক রাখাহয়েছে। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমার বোনের বিয়ে হয়েছিল বালিগঞ্জ প্লেসে। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, 'তোর গয়নাগাটি কিছু আমায় দে তো। দু'দিনের মধ্যেই তোকে ফেরত দিয়ে দেব।' ও বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে আমায় দিয়ে দিল।আমি সেগুলো নিয়ে সেই পরেশ দত্তের দোকানে গেলাম। গিয়ে বললাম, 'আপনারা এগুলো ওজন ক'রে দেখে বলুন যে -গযনাগুলো আমি রেখে গিয়েছিলাম, এগুলো রেখে সেই গুলো আমায় দিতে পারবেন কি না।' ওরা ওজন ক'রে বলল, হ্যাঁ পারবে। তখন তারা আগের গয়নাগুলো সেই কাপড়ের পুঁটলিবাঁধা অবস্থায় আমায় দিয়ে দিল। আমি সেটা নিয়ে গোপনে বৌদিকে দিলাম। পরদিনই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের পরের দিন আবার বৌদির কাছ থেকে গয়নাগুলো নিয়ে দোকানে জমা দিলাম, আমার বোনের গয়নাগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে এসে তাকে ফেরত দিয়ে গেলাম। মিটে গেল। কেউ কিছু জানতে পারল না।

বেশ কিছুদিন পর সত্যজিৎবাবু 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' -এ এক সাক্ষাৎকারে এই গয়না বন্ধকের গল্পটা করেন। মাসিমা তখনসত্যজিৎবাবু সম্পর্কে কাগজপত্রে যা যা বেরোত, সেগুলো সব কাটিং করে খাতায় লাগিয়ে রাখতেন। সত্যজিৎবাবু 'নিউইয়র্ক টাইমস্' - এর কাটিংটাও বিদেশ থেকে পাঠিয়েছিলেন বাড়িতে। কিন্তু তাতে একটা জায়গা কালি দিয়ে ঢাকা ছিল। মাসিমা সেটা দেখে বললেন, 'কালি দিয়ে যেটা ঢাকা আছে, সেটা কী আমি জানি। ওটাতে সেই গয়না বাঁধার কথাটা আছে। আমার কাছে তোমরা গোপন করতে পার, কিন্তু আমি সবই জানি।'

।।চার।।

শুটিং এদিকে বন্ধ হয়ে গেল। দত্তরা আর টাকা দিতে পারল না। অন্য নানা জায়গায় চেষ্টা করা হতে লাগল। চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ নামেএকটা খুব বড় ডিস্ট্রিবিউটার কোম্পানি ছিল। তারা একদিন যতটা ছবি তোলা হয়েছে, সেটা দেখতে চাইল। কিছুটা এডিট ক'রে তখন তিন-চার হাজার ফুটের মতো ছবি তৈরি হয়েছে। আমরা সেটা লাইটহাউসে তাদের দেখালাম। তারা দেখে পরদিন অফিসে দেখা করতে বলল। পরের দিন সেখানে পার্টনারদের কাউকেই পাওয়া গেল না। না বলার অস্বস্তি এড়াবার জন্য তাঁরা কেউ দেখাই করলেন না।

তবু নানা জায়গায় খোঁজ চলতে লাগল, নানা জনকে বলা হল। একবার শোনা গেল এক ডিস্ট্রিবিউটার ছবি দেখতে আসবে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারিতে। গিয়ে দেখা গেল, তারা সেই আগেকার গোলমেলে প্রোডিউসার। যাদের সঙ্গে রমাদেবীর ব্যাপারে আগেই গণ্ডগোল হয়েছিল। ওঁরা বললেন, 'আগে যা হয়েছে হয়েছে, আমরা ছবি দেখতে এসেছি। যদি ভালো লাগে তাহলে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন নেব।' সত্যজিৎবাবু কিন্তু বেঁকে বসলেন। বললেন, 'আমি তো আগেই আপনাদের বলে দিয়েছি রমা দেবী চান না আপনাদের সঙ্গে আমি ছবি করি। আমি আপনাদের সঙ্গে কাজ করব না, আপনাদের ছবিও দেখাব না।' ওঁরা মুখ গোমড়া ক'রে চলে গেলেন।

এমন সময় আমার আর - এক ইস্কুলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তার নাম হেমেন ভট্টাচার্য। সে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলকাতা পুলিসে লিটারেট কনস্টেবল -এর চাকরি পেয়েছিল। পরে সাব - ইনস্পে*র হয়। সে হঠাৎ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সিকিউরিটি স্টাফে পোস্টিং পেল। এই সময় তার সঙ্গে আমার দেখা। সে একদিন আমায় বলল, 'তোরা একবার কারো সূত্রে ডঃ রায়কে গিয়ে বল না? আমি দেখেছি উদয়শংকর কিছুদিন আগে ডাঃ রায়কে বলে সরকারের কাছ থেকে চল্লিশ - পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে গেলেন। তোদেরই বা বলে দেখতে দোষ কি?' আমি খুব একটা উৎসাহিত হলাম না। তবু একদিন কথা প্রসঙ্গে মাসিমাকে বললাম, 'আপনার সঙ্গেকি ডাঃ রায়ের কোনো চেনাশোনা আছে?' উনি বললেন, 'হ্যাঁ, একটা সূত্রে যোগাযোগ করতে পারি।'

তিনি একটা চিঠিও লিখে দিলেন।

দু'দিন বাদেই খবর এল ডাঃ রায়ের কাছ থেকে। সত্যজিৎবাবুকে উনি ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে, হোম পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের মিঃ মাথুর ছবিটা দেখবেন। মন্মথ রায় ছবি দেখবেন। তাঁরা রিপোর্ট দেবেন, তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' ছবি দেখানো হল তাঁদের। তাঁরা কি রিপোর্ট দিলেন আমি জানি না। কিন্তু সরকার টাকা দেবে এটা স্থির হল। অসুবিধা দেখা দিল। হোম পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের ডকুমেন্টারি ছবি তৈরির করার জন্য টাকা বরাদ্দ ছিল। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনঐ ডকুমেন্টারি তৈরি করত। কিন্তু ফিচার ফিল্মের জন্য কোনো বরাদ্দ ছিল না। ডাঃ রায়ই বোধহয় তখন বললেন যে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের বাজেট বরাদ্দ থেকে পথের পাঁচালী-কে টাকা দেওয়া হোক।

নৃপেন মিত্র তখন সরকারের লিগাল রিমেমব্রান্সার। তাঁর সঙ্গে সত্যজিৎবাবুর একটা লিখিত চুক্তি হল। সত্যজিৎবাবুর যেদশ হাজার টাকা ছবিতে খরচ হয়েছিল, সেটা সিকিউরিটি হিসেবে থাকবে। রাণা দত্তরা যে টাকা দিয়েছিল তা ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। রমা দেবীকে ছবির রাইট হিসেবে কিছু টাকা দেওয়া হবে। সত্যজিৎবাবুর কোনো ফি ছিল না। টেকনিশিয়াদের জন্যও বাঁধাধরা ফি সেই চুক্তিতে লেখা ছিল না। পরে বংশীবাবু, সুব্রতবাবু, আমি, সামান্য কিছু কিছু টাকা পেয়েছিলাম। সত্যজিৎবাবু তখন বলেছিলেন যে বিদেশে ছবি দেখিয়ে যদি কিছু টাকা পাওয়া যায়, তাহলে সেই ফরেন রাইট যেন তাঁর থাকে।

দীর্ঘ চুক্তিপত্র সই হয়ে গেল। তারপর সেই দলিলের পাতার পর পাতা খুঁজে দেখা গেল যে ফরেন রাইটের ব্যাপারটার কোনো উল্লেখই নেই। মিঃ মাথুরকে সেটা বলা হল। তিনি তখন পথের পাঁচালী-র পুরো ব্যাপারটাকেই সরকারি টাকার অপচয় বলে মনে করতেন। ডাঃ রায়ের একটা খেয়ালের জন্য এই ছেলেমানুষি কাণ্ড হচ্ছে, এইরকমই ধারণা ছিল তাঁর। ফিল্ম সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। একবার পথের পাঁচালী দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁদেরই কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'আরে, উল্টাচলতা হ্যায়, উল্টা চলতা হ্যায়।' সে জায়গাটা হল শ্রীমিবাস ময়রা পুকুরপাড় দিয়ে চলেছে, পেছনে অপু-দুর্গা, তাদের ছায়া পড়েছে পুকুরের জলের ওপর। স্বভাবতই ছায়াগুলো উল্টো। যাক্, মিঃ মাথুর ফরেন রাইটের কথা বিশেষ আমল দিলেন না। বললেন, 'ও তো সামান্য ব্যাপার। পরে একটা চিঠি দিয়ে ওটা ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে।'

বেশ কিছুদিন পর পথের পাঁচালী যখন দেশে-বিদেশে খুব ভালো চলছে, সে সময় সত্যজিৎবাবু একবার ডাঃ রায়ের সঙ্গেদেখা ক'রে এই প্রসঙ্গটা তোলেন। ডাঃ রায় বললেন, 'এগ্রিমেন্টে কি আছে ফরেন রাইটের কথা?' সত্যজিৎবাবু বললেন, 'না নেই, কিন্তু তখন আমায় বলা হয়েছিল চিঠি দিয়ে নাকি ওটা ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে।' ডাঃ রায় বললেন, 'না না, এগ্রিমেন্টে না থাকলে কীক'রে হবে?' সত্যজিৎবাবু অত্যন্ত খুন্ন হয়েছিলেন এই ঘটনায়। কিছুদিন পর ওয়াশিংটনে একটা বিশেষ ফেস্টিভালে পথের পাঁচালীদেখানো হয়। মিসেস রুসভেল্ট সেই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। সত্যজিৎবাবু সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ডাঃ রায় তখন প্রস্তাব দেন সরকারের পক্ষ থেকে সত্যজিৎবাবু যেন সেই অনুষ্ঠানে যান। সত্যজিৎবাবু রাজি হননি।

।।পাঁচ।।

পথের পাঁচালী - তে লাইটের নানারকম খুঁটিনাটি ব্যাপার ছিল। রোদ, মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, রাত্রি, সবরকম অবস্থাতেই শট্ ঠিল। আমরা কালো কাটের মধ্যে দিয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকতাম, কতক্ষণে মেঘ এসে তাকে ঢেকে দেয়। তারপর মেঘের আয়তন দেখে আন্দাজ করতে হতো পুরো শট্টা ঐ মেঘলা অবস্থার মধ্যে নেওয়া যাবে কি না। এই ক'রে ক'রে গ্রামের চাষীদের মতো আমরাও আবহাওয়ার ব্যাপারে রীতিমতো এ'পার্ট হয়ে গিয়েছিলাম। সত্যজিৎবাবু তো এমনই এ'পার্ট হয়ে গিয়েছিলেন যে মেঘ দেখেই বলে দিতেপারতেন তাতে বৃষ্টি হবে কি হবে না। মেঘের ব্যাপারে আরো সমস্যা ছিল। একবার হয়ত রোদ দেখে সুব্রতবাবু রিফ্লে*রগুলো জায়গা মতো বসিয়ে শট্ রেডি করলেন। এমন সময় মেঘ এসে গেল। মেঘ কাটার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া তখন উপায় নেই। কিন্তু মেঘ থাকাকালীন সূর্যটাও তো খানিকটা সরে গেছে। মেঘ যখন কাটল, তখন দেখা গেল রিফ্লে*রগুলো আবার নতুন ক'রে বসাতে হবে। তখন রিফ্লে*র অ্যাডজাস্ট করতে করতে হয়ত আবার মেঘলা হয়ে গেল। এইরকম ক'রে মেঘলা দিনে শট্ নিতে গিয়ে বহু দেরি হয়ে যেত। মেঘের আয়তন আর চলার গতি দেখে আমি হয়ত বলতাম, 'এবার এ শট্টা হয়ে যাবে।' সবসময় ঠিক হতো না, শেষ দিকটা হয়ত কিছুটা মেঘ এসে গিয়ে আলোটা আবছা হয়ে যেত। সেটা আবার তখন সুব্রতবাবুকে বলে দিতে হতো।

পথের পাঁচালী দেখে অনেকেই চট ক'রে বুঝতে পারবেন না বৃষ্টি, মেঘ, রোদ, ছায়া এগুলো কতটা এই ছবির মধ্যে কাজ করেছে। যেমন ধরা যাক, সর্বজয়ার চিঠি পাওয়ার দু'টো দৃশ্য। প্রথম চিঠিটা দুঃখের, পরেরটাতে সুসংবাদ। প্রথম চিঠিটা যখন সর্বজয়া পড়তে শুরু করে, তখন তার মুখটা আলোতে। চিঠি পড়তে পড়তে ক্রমশ সে এগিয়ে আসে, তার মুখের ওপর ছায়া এসে পড়ে। পরের চিঠিটা পড়া শুরু হয় ছায়াতে, পড়তে পড়তে এগিয়ে এলে সর্বজয়ার মুখ আলোয় এসে যায়। আর একটা দৃশ্য, সেজোঠাকরুণ যখন দুর্গা চুরি করেছে নালিশ করতে আসে। সেই সিকোয়েন্সটা অর্থাৎ অপুকে খাওয়ানো থেকে শুরু ক'রে দুর্গাকে বাড়ির বাইরেবের করে দিয়ে বন্ধ দরজার সামনে সর্বজয়ার বসে পড়া - এই পুরো সিকোয়েন্সটাতে আমার যতদূর মনে পড়ে ৬৪টা শট্ ছিল। সমস্তটাই মেঘের নিচে তোলা

আর্থিক কারণে পথের পাঁচালী-র মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেকগুলো অংশ ঠিকমতো তোলা যায়নি। যেমন সেই বিখ্যাত বৃষ্টির দৃশ্য। অপু ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে। আকাশে মেঘ জমেছে। দুর্গা পুণ্যিপুকুর পুজো শেষ করল। ঝড় এসে পড়ল। দুর্গা ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। অপু জানলা দিয়ে বইখাতা ফেলে দিয়ে তার পেছন পেছন ছুটল। এইখানে ঝড়ে আম পড়া, অপু - দুর্গার আম কুড়োনোর দৃশ্য থাকার কথা ছিল। আর্থিক অভাবে বছরের ঠিক সময়টা বেছে নিয়ে ঝড়ের দৃশ্য তোলা সম্ভব হয়নি।

আর একটা দৃশ্য মূল স্ক্রিপ্টে ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন তোলা হয়নি আমি জানি না। মূল স্ক্রিপ্টে ছিল, অপু একটা ঝাড়লণ্ঠনের ভাঙা অংশ কুড়িয়ে পায়। সেই কাচটা অনেকটা হীরের মতো দেখতে। দুর্গা সেই কাচের টুকরোটা তার মা-কে দেখিয়ে বলে, 'দেখ, একটা হীরে খুঁজে পেয়েছি।' সেই কাঁচ দেখানোর দৃশ্যটা লাইটের অনেক কৌশল ক'রে তোলা হয়। দুর্গা কাচটা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছে আর সেটার ওপর থেকে আলো ঠিকরে দুর্গার মুখের ওপর পড়ছে। পরে প্রচণ্ড আর্থিক কষ্টের মধ্যে সর্বজয়ার একবার সেই কাচের টুকরোটার কথা মনে হয় - যদি সত্যি সেটা হীরে হয়। কিন্তু ঐ পরের অংশটা আর তোলা হয়নি। হয়ত সত্যজিৎবাবু পরিকল্পনাটা বদলেছিলেন।

দূর্গা মার যাওয়ার দৃশ্যটাতে যেখানে নীলমণির স্ত্রী অপুর সঙ্গে এসে সর্বজয়ার কোলে মৃত দুর্গাকে দেখে, সেখানে একটা ক্লোজ - আপে দেখা যায় ঘরের মেঝেতে শোয়ানো দুর্গার হাতটা নীলমণির স্ত্রী ধরে রয়েছে। এই দৃশ্যটা যখন প্রথম প্রোজেকশনে আমরা দেখি তখনই সত্যজিৎবাবু সুব্রতবাবুকে বলেছিলেন, 'এখানে লাইটটা একটু বেশি আছে।' এখনো ছবিটা ভালো ক'রে দেখলে বোঝা যাবে, সত্যিই এখানে লাইটটা আর একটু কম হলে ভালো হত। কিন্তু তখন আর নতুন ক'রে শট্ নেবার মতো সামর্থ্য আমাদের ছিল না।

এরকম ছোটখাটো ভুলচুক আরো ছিল। যেমন ঐ দৃশ্যেরই ঠিক আগের অংশটাতে যখন নীলমণির স্ত্রী অপুর সঙ্গে বাড়িতেঢুকছে। উঠোনে জল জমে রয়েছে, আকাশ মেঘলা। কিন্তু ভালো ক'রে লক্ষ করলে দেখা যাবে, উঠোনে বাঁ-দিকটাতে ছোট এক ফালি রোদ থেকে গেছে। এটাও রি-টেক করা যায়নি।

কাশবনের দৃশ্যে সত্যজিৎবাবুর পরিকল্পনা ছিল খুব ভালো ক'রে দেখানো যে অপু ট্রেন দেখতে পেল, দুর্গা পেল না। গল্পের দিক থেকে এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। পরেও দেখা যায়, দুর্গা যখন খুব অসুস্থ তখন সে অপুকে বলছে, 'আর একদিন ট্রেন দেখতে যাব।' কিন্তু দুর্গা মারা গেল। ট্রেন দেখা তার আর হল না। সেই কাশবনের দৃশ্যের শেষে অপু যখন ট্রেন দেখতে পায় তখন দেখা যায় দুর্গা ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। তাতে কিন্তু দর্শক খুব ভালো ক'রে বুঝতে পারে না যে দুর্গা ট্রেন দেখতে পায়নি। এর জন্য আর একদিন শুটিং করা দরকার ছিল। সেটা আমরা করতে পারিনি।

এই ত্রুটিগুলো পথের পাঁচালী - তে যে থেকে গিয়েছে, তার মূল কারণ আর্থিক। না হলে সত্যজিৎবাবু যা খুঁতখুতে লোক,আর খুঁটিনাটি ব্যাপারের দিকে যতটা মনোযোগ, তাতে আর্থিক সংগতি থাকলে ঐ শট্গুলো নিশ্চয়ই রি-টেক করা হতো। এই ডিটেলইল্স এর ওপর তাঁর নজর নিয়ে বহু গল্প করা যায়। যেমন, দুর্গা মারা যাওয়ার পর ছবিতে যে দৃশ্যগুলো আছে। সবথেকে বিখ্যাতদৃশ্যটি যেখানে হরিহর অনেকদিন পর বাড়িতে ফেরে, নাম ধরে ডাকে, কিন্তু দুর্গা নেই আর। সর্বজয়ার মানসিক প্রতিক্রিয়া বোঝাতেহবে। সে অনড় থাকে। কিন্তু অনড় হলেও একেবারে পাথর তো নয়। সুতরাং এই ডাকটাতে সামান্য একটু প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় হবে। সেইটে দেখাতে গিয়ে সত্যজিৎবাবু পরিকল্পনা করলেন, সর্বজয়া গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে। হরিহরের ডাকে তার পেশী সামান্য ঢিলে হবে, তাতে হাতের শাঁখাটা একটু নেমে যাবে। এই শাঁখা নেমে আসাটা দেখাতে গিয়ে সাতবার দৃশ্যটা টেক্ করতে হয়েছিল।

চড়ুইভাতির দৃশ্যে দুর্গা বলে, 'আমার আর বিয়েই হবে না।' পরে যখন রাণুর বিয়েতে কনে সাজানো হচ্ছে, দুর্গা সেখানে বসে আছে। সেই দৃশ্যে সত্যজিৎবাবু হঠাৎ দুর্গার কপালের ওপর থেকে একগাছা চুল চোখের ওপর দিয়ে ফেলেছিলেন। তাতে দুর্গার মুখ এমন ট্র্যাজিক হয়েছিল, এখনো সেই দৃশ্যটা দেখলে আমার কান্না পায়।

দুর্গার মৃত্যুর পর হরিহরের বাড়ি আসার দৃশ্যটাতে যখন প্রথম হরিহরকে বাড়ির বাইরে দেখা যায়, তখন থেকে সর্বজয়ারআসা পর্যন্ত একটা দীর্ঘ -সময় সবকিছু স্তব্ধ হয়ে থাকে। হরিহরকে শুধু দেখা যায় বাড়ির চারদিকে তাকিয়ে দেখছে চাল পড়ে গেছে,রান্নাঘর ভেঙে গেছে, পাঁচিলের ওপর একটা গাছ এসে পড়েছে ইত্যাদি। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই, কোনো মুভমেন্ট নেই। সত্যজিৎবাবু হঠাৎ বললেন, এইখানে সামান্য একটু মুভমেন্ট রাখা দরকার। জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে গরুটা যদি জবার কাটে তাহলে এই স্টিল অবস্থটা একটু ভাঙা যায়।' সেদিন

সুটিং -এর সকালে গরুটাকে প্রচুর খাইয়ে দেওয়া হল, সময়মতো গরুটা জাবর কাটল।

আরো কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়। সর্বজয়া রান্নাঘরের মধ্যে খাচ্ছে - এমন সময় ইন্দির এসে জল চায়। সর্বজয়া ইন্দিরকে বলে নিজে জল গড়িয়ে নিতে। এখানে সত্যজিৎবাবু সর্বজয়াকে নির্দেশ দিয়েছিলেন খুব ভালো ক'রে ডাঁটা চিবিয়ে খেতে, সেইনুযায়ী ডাঁচা চচ্চড়ির ব্যবস্থাও হয়েছিল। এই চিবনোর ব্যাপারটা কোথায় যেন সেই মুহূর্ত সর্বজয়ার চরিত্র ও গোটা সিচুয়েশানকে খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেয়।

অন্য এক জায়গায় যেখানে সর্বজয়া অপুকে খাওয়াচ্ছে, সত্যজিৎবাবু সর্বজয়াকে নির্দেশ দিলেন খাওয়াবার সময় নিজেও যে সামান্য একটু হাঁ করে। এটা ঐ দৃশ্যের বাস্তবতাকে কতখানি প্রাণ দিয়েছিল তা সবাই বুঝতে পারবেন না। অথচ ব্যাপারটা খুব সামান্য।

প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় প্রসন্ন যখন বেতটা রাখে তখন সত্যজিৎবাবু বললেন সেটাকে নুনের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়ে রাখতে, যাতে প্রসন্ন বেতটা তুলে নেবার সময় খানিকটা নুন ছিটিয়ে পড়ে চারদিকে। ঐ দৃশ্যের উপর এটা একটা অন্য মাত্রা যোগকরেছিল, সন্দেহ নেই।

দুর্গার আর জ্বর হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা ক'রে সর্বজয়া তার কপালে হাত দেয়। সত্যজিৎবাবুর নির্দেশ, দুর্গা মাথাটা সামান্য পিছিয়ে নেবে - যেমনটা স্বাভাবিক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

প্রথমদিকে একটি দৃশ্যে ছোট দুর্গা ইন্দিরের পিছনে বসে আছে, ইন্দির খাচ্ছে। খাদ্যবস্তু ছিল ছাতু। সত্যজিৎবাবু ইন্দিরকে বললেন বেশ চেটেপুটে ছাতুটা খেতে। সেটা করায় গোটা সিচুয়েশান ও তার নিজের চরিত্রটি চমৎকার ফুটে উঠল।

অসুখের সময়ই মাত্র দুর্গাকে চুলের দুই বিনুনি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন সত্যজিৎবাবু। এই অসুখেই দুর্গার মৃত্যু। ঐ দুই - বিনুনি - বাঁধা দুর্গাকে দেখলে দর্শকের মনে অজান্তে একটা ট্র্যাজিক ইমেজ গড়ে ওঠে।

গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার আগের দৃশ্যে, গ্রামের মাতব্বররা এসেছে হরিহরের সঙ্গে দেখা করতে। একজন একটা বা'রে উপর বসে। সত্যজিৎবাবু নির্দেশ দিয়েছিলেন বা'রে নিচে একটা ইঁটের টুকরো রাখতে, যাতে বা'টা একদিকে হেলে পড়ে। ঐ মুহূর্তে একটা বিপরীত রস তৈরি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এটা মূল রসকে পুষ্ট করতে সাহায্য করেছে, সেটা ভাবলেই বোঝা যায়।

ছবির শেষে হরিহররা যখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, তখন বাস্তুসাপ ঘরে ঢোকার ব্যাপারটা নিয়েও একটু বলা দরকার। আমার মনে হয় না সত্যজিৎবাবু এই সংস্কারটা আদৌ বিশ্বাস করেন। সেটা দেখানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ছবির অন্তিম মুহূর্তে, যখন মূল গল্পটা শেষ হয়ে গিয়েছে, অথচ তার পরে হরিহরের গরুর গাড়ি ক'রে চলে যাওয়ার দৃশ্যটা আসবে -এর মাঝখানে খানিকটা নাটকীয়তা সৃষ্টি করার জন্যই মনে হয় সত্যজিৎবাবু ঐ সাপের ব্যাপারটা এনেছিলেন। সাপ ঘরে ঢুকছে এতে স্বভাবতই দর্শকের মনে একটা কৌতূহল জাগে । এর পর তাহলে কী হবে? সুতরাং পরের দৃশ্য পর্যন্ত তার কৌতূহলটা বজায় থাকে। হয়ত তাই সত্যজিৎবাবুর মাথায় সাপের ব্যাপারটা আসে।

কিছু কিছু জায়গায় এত খুঁটিনাটি কাজ আছে যে তা কোনো দর্শক আদৌ লক্ষ করে কি না সন্দেহ আছে। যেমন ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর দৃশ্যে, দুর্গা যখন এসে তাকে নাড়া দেয়, তার মৃতদেহ একপাশে পড়ে যায়। মাথাটা ঠক্ ক'রে মাটিতে লাগে। সত্যজিৎবাবু সেখানে বংশীবাবুকে বললেন যে ক্যামেরার বাইরে থেকে মাথার সামনের ঘাসটাকে একটু বাতাস দিতে। তাহলে মৃত মুখটার সামনে দেখা যাবে একটা ঘাস বাতাসে সামান্য নড়ছে। কিন্তু আমরা যারা শুটিং -এ উপস্থিত ছিলাম তারা ছাড়া আর কেউ সেটা লক্ষ করেছে কিনা আমি জানি না। তবে এটা নিশ্চয় সত্যি যে এ-সব খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো শেষ পর্যন্ত একটা গোটা পরিবেশ সৃষ্টি ক'রেদর্শকের মনে দাগ কাটে। আলাদা আলাদা করে ডিটেলগুলো বিশেষ কেউ লক্ষ করে না।

সত্যজিৎবাবু, বংশীবাবু আর সুব্রতবাবু তিনজনই অসম্ভব খুঁতখুঁতে লোক। তাঁদের নিজেদের কাজ সম্পূর্ণ নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত শট্ নেওয়া যেত না, সকলকেই অপেক্ষা ক'রে থাকতে হতো।

'কি বংশী আর কতক্ষণ?' 'কি সুব্রত, আর কতক্ষণ?' -এ কথা যে কতবার শুনেছি তার আর ইয়ত্তা নেই।

।।ছয়।।

এক এক দফা শুটিং শেষ ক'রে এসে এ'পোস্‌ড ফিল্মগুলো বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটোরিতে জমা দেওয়া হতো। পরদিন সেখানে রাত পর্যন্ত ধর্না দিয়ে বসে থাকতাম সত্যজিৎবাবু, বংশীবাবু, সুব্রতবাবু, আমি, আরো কেউ কেউ। যখনই প্রিন্ট পাওয়া যেত তখনি প্রোজেকশন ক'রে দেখতাম। এ নিয়ে সিনেমা পাড়ায় একটু হাসিঠাট্টাও হতো। এরা কী রকম লোক, শুটিং ক'রে পরদিনই প্রিন্ট দেখা চাই!

এখানে বলা দরকার, নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টের ডিরে*র মনরো হুইলার এদেশে এসেছিলেন ইণ্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখতে ও বাছাই করতে। তিনি সত্যজিৎবাবুর কাছে পথের পাঁচালী-র কিছু স্টিল দেখেন এবংসঙ্গে সঙ্গেই স্থির করেন ছবিটা শেষ হলে তিনি মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টে ছবিটির প্রদর্শনী করবেন। আমেরিকান চিত্রপরিচালকওমনরো হুইলারের বন্ধু জন হিউস্টন কলকাতায় এসেছিলেন এবং তিনি হুইলারের নির্দেশ মতো ছবিটির খোঁজখবর নেন। ছবি তখন অনেকটা হয়ে এসেছে। যাই হোক, হিউস্টন পথের পাঁচালী-র কিছু অংশ দেখার সুযোগ পান এবং তাঁর ধারণা হয় ছবিটি বিদেশে দারুণ ভাবে প্রশংসা পাবে। সে কথা তিনি ফিরে গিয়ে হুইলারকে বলেনও। সুতরাং পুর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পথের পাঁচালী নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মর্ডান আর্ট-এ দেখাবার দিন-ক্ষণ পাকা হয়ে যায়। ওরা ছবিটার নাম দিয়েছিল 'রেইন'।

শেষ মুহূর্তে এবার খুব তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টে একটা নির্দিষ্ট তারিখে ছবি পাঠাতে হবে। বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটচরিতে বহু রাত পর্যন্ত কাজ হতে লাগল। সত্যজিৎবাবু, আমি, শান্তি চ্যাটার্জি, দুলাল দত্ত, তার অ্যাসিস্টেন্ট, মাঝেমাঝে সুব্রতবাবু, বংশীবাবু, এরা সকলে বেঙ্গল ফিল্ম খ্যাবরেটরিতে এডিটিং -এর কাজ করতে লাগলাম। রাত দশটা-এগারটার আগে বাড়ি যেতাম না।

রবিশংকর এলেন কলকাতায় মিউজিক রেকর্ডিং -এর জন্য। কিন্তু তাঁকে তখন ছবি দেখাবার সময় নেই। সেদিন দুপুর দেড়টার সময় টালিগঞ্জের ভবানী সিনেমাতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পথের পাঁচালী ছবিটা একবার একটু দেখাতে পারেন?' ওরা বলল, 'আমাদের ম্যাটিনি শো তো শুরু হয়ে যাবে, আড়াইটেয় লোক ঢুকবে। তার আগে যতটা পারেন দেখে নিন।' আমরা মোটে সাতরীল ছবি রবিশংকরকে দেখাতে পেরেছিলাম। ওখান থেকে সোজা চলে এলাম টেকনিসিয়ান্‌স স্টুডিওতে। ভোর চারটে পর্যন্ত ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক রেকর্ডিং হল। নানাভাবে সত্যজিৎবাবু তাঁকে দিয়ে বেশ কিছু অংশ করিয়ে নিলেন - পরে যাতে নিজের দরকার মতো সেগুলো বসাতে পারেন। দু-একটা অতিরিক্ত সংগীতও পরে অন্যদের দিয়ে করাতে হয়। যাই হোক, সেখান থেকে রবিশংকর বাইরে কোথায় প্রোগ্রাম করতে চলে গেলেন।

সাউ' চ্যানেলিং ইত্যাদির কাজ তখনো বাকি রয়ে গেছে। হঠাৎ দেখা গেল সময় একেবারে নেই। শেষ ছয় - সাত দিন সত্যি সত্যিই দিনরাত একটানা কাজ হয়েছিল। ঐ সময় কেউবাড়ি যেতাম না। বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরিতেই থাকা। স্নান, দাড়ি কামানো নেই, ঘুমও নেই। ছয় - সাত দিন যে না ঘুমিয়ে থাকা যায়, আমি আগে জানতাম না। কিন্তু তাই হয়েছিল। একদিন তো সত্যজিৎবাবুর পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'মানিকবাবু, আমি আর পারছি না।' সত্যিই সে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। তখন চ্যানেলিং হচ্ছে, রি-রেকর্ডিং হচ্ছে। মাঝে মাঝে ভুল হচ্ছে। আবার নতুন ক'রে চ্যানেলিং হচ্ছে। শেষ দিন ল্যাবরেটারির মালিক মেহতাজীও সারারাত জেগে কাজ করেছিল। সে না থাকলে পরদিন আর ছবিটি পাঠানো যেত না।

পরদিন সকালে ফাইনাল প্রিন্টের মাত্র তিন-চার রীল আমরা দেখতে পেলাম। বাকি প্রিন্ট তখনো হচ্ছে। সেগুলো ভালো হল কি খারাপ হল, সত্যজিৎবাবু তখনো জানেন না। কিন্তু তখনই বেরোতে হল কাস্টমস্, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইত্যাদির জন্য। ওয়েলেসসিস্ট্রিটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা গোডাউন ছিল। ছবি পাঠাবার জন্য সেখান থেকে আমাদের একটা ট্রাঙ্ক নেবার কথা। সেখানে গিয়ে আমরা অপেক্ষা করছি। সত্যজিৎবাবু চেয়ারে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ওদের লোকজন ভাবল বুঝি সাংঘাতিক শরীর খারাপ। ডাক্তার ডাকার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি একটু নাড়া দিতেই সত্যজিৎবাবু জেগে উঠলেন।

প্রিন্টগুলো যখন গাড়িতে তোলা হচ্ছে আমাদের সমস্ত লোকজন তখন গাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। ঠিক যেন মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছে। এইরকম ভাব। প্যান-অ্যামের অফিসে যাচ্ছি প্রিন্ট নিয়ে। ভাবছি প্যান - অ্যামের অফিসে সাহেব-টাহেব থাকবে, সেখানে যদি ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে কেলেঙ্কারি হবে। কিন্তু সাহেবদের ভয়েই হোক বা যে কারণেই হোক, সেখানে ঘুমিয়ে পড়িনি। প্রিন্টপৌঁছে দিয়ে বাড়ি চলে গেলাম। টানা চব্বিশ ঘন্টা ঘুমিয়েছিলাম তারপর।

।।সাত।।

তারপর নতুন যন্ত্রণা শুর হল। ছবি শেষ, কিন্তু রিলিস হচ্ছে না। সরকারকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা, সে এক দূরূহ কাজ। তখনকার দিনে সেনসর বোর্ডকে যখন ছবি দেখান হতো, তখন বাইরের লোকেরাও অনেকে সেখানে থাকত। মিনার - বিজলী - ছবিঘরের মালিক ধীরেন দে সেদিন ছবিটা দেখলেন। তারপর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছবি কে ডিস্ট্রিবিউট করবে?' আমি বললাম, 'সে কিছুই ঠিক হয়নি। সরকারের ব্যাপার, বুঝতেই তো পারেন।' তিনি বললেন, 'আপনারা নিজেরা ডিস্ট্রিবিউট করুন। আমি সাহায্য করব।'আমি বললাম, 'আমরা কি ক'রে ডিস্ট্রিবিউট করব? পাবলিসিটির অত খরচ তো আমরা দিতে পারব না। তাছাড়া মফস্বলের হলের সঙ্গে তো আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই।' তিনি বললেন, 'সে সব আমি যোগাযোগ ক'রে দেব। পাবলিসিটিতে আপনাদের চল্লিশ হাজার টাকার মতো খরচ হবে। সেটা আমি অ্যাডভ্যান্স দেব। আপনারা সরকারকে রাজি করান।'

আমরা তখন 'দর্পণ কথাচিত্র' -এর নামে সরকারকে চিঠি দিলাম যে মাত্র আড়াই পারসেন্ট কমিশনে আমরা পথের পাঁচালী ডিস্ট্রিবিউট করতে রাজি আছি। কিন্তু সরকারের দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ গেল না।

ডিস্ট্রিবিউটর ঠিক হয়নি, এদিকে সত্যজিৎবাবু একটা কাণ্ড করলেন। কারুকৃৎ কোম্পানি, যারা ব্যানার - হোর্ডিং ইত্যাদি দেয়, সত্যজিৎবাবু ডি. জে. কীমারের সূত্রে তাদের ভালো চিনতেন। পথের পাঁচালী-র জন্য উনি কয়েকটা বিশাল বিশাল ব্যানানের অর্ডার দিলেন। রাসবিহারী মোড়ে, চৌরাঙ্গিতে একটা জায়গায় - যেসব জায়গায় তখন ফিল্মের কোনো ব্যানার পড়ত না, সেইসব জায়গায় সত্যজিৎবাবু ব্যানার লাগাতে বললেন। এছাড়া শ্যামবাজার, হাওড়া ব্রিজের ওঠার মুখে, শেয়ালদার অনেকগুলো জায়গায় ব্যানার দেওয়া হল। সে সময় সিনেমার ব্যানার খুব ছোট ছোট হতো) আট ফুট বাই ছয় ফুট, এইরকম সাইজের। পথের পাঁচালীর-ব্যানার হল তিরিশ ফুট বাই কুড়ি ফুট, কিংবা পঁচিশ ফুট বাই পনের ফুট, এইরকম বিরাট বিরাট ব্যানার। সত্যজিৎবাবু নিজেই সেগুলো ডিজাইন ক'রে দিয়েছিলেন। সেই ব্যানার তখন কলকাতায় বেশ একটা হৈ - চৈ ফেলে দিয়েছিল, ছবি রিলিস করার আগেই। তাছাড়া এসপ্লানেডে কে. সি. দাসের ওপরে একটা নিওন বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল - অপু - দুর্গার হাত ধরে দৌড়ে যাচ্ছে। সমস্ত পাবলিসিটিটাই অবশ্য বাকিতে, পরে টাকা দেওয়া হবে এই বন্দোবস্ত ছিল। সত্যজিৎবাবুর ভাবটা হল, ডিস্ট্রিবিউটর তো একদিন ঠিক হবেই, ব্যানার লাগিয়ে দাও।

পথের পাঁচালী ছবি দেখার আগেই কিন্তু কলকাতায় বহু লোকের মধ্যে ছবিটা নিয়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সেটামূলত এই নতুন ধরনের পাবলিসিটির জন্য। অনেকেরই হয়ত এ কথাটা এখন মনে নেই, তখন কিন্তু এটা সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার ছিল।

কিছুদিন পর ডি লু' ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটরের মুরলীধর চ্যাটার্জিকে ছবিটা দেখানো হল। তিনি উৎসাহিত হলেন। কিন্তু সরকার কী শর্তে ডিস্ট্রবিউশন দেবে, তা আমরা কিছুই জানি না। পনের, সাড়ে সাতের, কুড়ি পারসেন্ট, এইরকমই কমিশন ছিল ডিস্ট্রিবিউটরদের। মুরলীবাবু ওঁর কোম্পানির তরফ থেকে সরকারকে চিঠি দিলেন যে পনের পারসেন্ট কমিশনে উনি ডিস্ট্রিবিউশন নিতে রাজি আছেন। ক-দিন পর হঠাৎ সত্যজিৎবাবুর কাছে ফোন হল যে ডি লু' ডিস্ট্রিবিউশন পায়নি। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন পেয়েছে। ঐ পনের পারসেন্ট কমিশন। কিভাবে এই সিদ্ধান্তটা হল, আমি জানি না। কিন্তু অবশেষে পথের পাঁচালী ডিস্ট্রিবিউটর পেল।

অরোরার তখন 'গোধূলি' নামে আর একটা ছবি ছিল। সেটাতে তারা অনেক টাকা দিয়েছিল। সেইজন্যই বোধহয় পথের পাঁচালী বীণা আর বসুশ্রীতে মাত্র পাঁচ সপ্তাহের ফি'ড্ বুকিং পেল। এছাড়া ছায়া, যেখানে কখনো বাংলা ছবি দেখানো হতো না, আর শ্রী-তে ছেবি রিলিস করল। অরোরার অজিত বসুও আগে ছবি দেখেছিলেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু ব' অফিস সম্পর্কে বোধহয় মনে মনে একটু সন্দেহ ছিল। প্রাচী আর ইন্দিরা, সবচেয়ে ভালো দু'টো হলে, তাই 'গোধূলি' রিলিস করল।

পাঁচ সপ্তাহ পর বসুশ্রী আর বীণা থেকে ছবি তুলে নিতে হল। অনেকের মনে এখনো একটা ধারণা আছে যে মুক্তি পাওয়ার পর প্রথম প্রথম পথের পাঁচালী খুব ভালো চলেনি। বিদেশে হৈ - চৈ হওয়ার পর নাকি ছবিটা এখানে চলতে শুরু করে। কথাটা একেবারে ভুল। বসুশ্রীর হিসেবে দেখলেই সেটা পরিষ্কার হবে। সেখানে সপ্তাহে একুশটা শো যদি হাউসফুল হয়, তাহলে মোট টাকার অঙ্ক হয় বিশ হাজার টাকা। পাঁচ সপ্তাহ টানা হাউস ফুল গেলে মোট টাকা হয় এক লক্ষ। পথের পাঁচালী-র পাঁচ সপ্তাহে বসুশ্রীতে টিকিট বিক্রি হয়েছিল ৯৬ হাজার টাকা। পথের পাঁচালী প্রথম দিকে চলেনি, এটা সম্পূর্ণ ভুল।

বসুশ্রীতে সে-কদিন অবস্থাটা যে কী হয়েছিল, এখন সেটা ঠিক বলে বোঝানো যাবে না। এমন দর্শক দেখেছি যে ম্যাটিনি দেখে ইভিনিং -এর টিকিট কাটতে, ইভিনিং দেখে নাইট শো-র টিকিট কাটতে। ভানু ব্যানার্জি উৎসাহের চোটে বসুশ্রীর কাউন্টারে দাঁড়িয়ে টিকিট বিক্রি করেছিলেন। ছবি দেখে সে একটা মন্তব্য করেছিল আমার কাছে, 'ব্যাঙ যে মইরা গ্যালে চিৎ হইয়া থাকে, সত্যজিৎ রায় কইলকাতার লোক, সে জানল কি কইর‍্যা?'

পথের পাঁচালী-র সাফল্যের পর ডিলু' ফিল্মের মুরলীধরবাবু সত্যজিৎবাবুর কাছে প্রস্তাব দিলেন পর পর পাঁচটা ছবির চুক্তি করার জন্য। বি. টি. রোডের ওপর এম. পি. স্টুডিওয় শুটিং হবে। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চলতে লাগল। এক সময় মুরলীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'টেকনিসিয়ান কারা থাকবে?' সত্যজিৎবাবু বললেন যে মূল টেকনিসিয়ান সব ওঁর নিজেরই থাকবে। মুরলীবাবু তখন তাদের পারিশ্রমিকের কথাটা জানতে চাইলেন। আমি বললাম কে কত পাবেন। মুরলীবাবু বললেন, 'আমার স্টুডিওতেযারা কাজ করে তাদের চেয়ে এদের রেমুনারেশন তো অনেক বেশি। আপনারা এত বেশি দিলে আমি তো খুব ঝামেলায় পড়ে যাব।' সত্যজিৎবাবু বললেন 'এটা তো আমি কমাতে পারব না। স্টুডিও টেকনিসিয়ানরা যা রেমুনারেশন পায়, তা অত্যন্ত অযৌক্তিক। এটাও আমি বদলাতে চাই।' মুরলীবাবুর সঙ্গে ছবি করা আর হল না।